আত্ম, ব্রহ্মত্ব ও যোগবিজ্ঞান

*ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষু শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ নিবাকরণ মস্ত্বনিরাকরণং মে অস্তু তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮/১৫/১, শান্তি পাঠ)।

বিশ্বের আদি স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা একদা বিবদমান দেবকুল ও অসুরগণকে বলেছিলেন : 'তোমরা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভূত্ব ও ক্ষমতা স্থাপন করার জন্য কি কারণে যুদ্ধ করছ? তোমরা আত্মাকে বিদিত হও, কারণ যার আত্মজ্ঞান আছে তিনিই শান্তি লাভ করেন। আত্মা পাপবর্জিত, বার্ধক্য ও মৃত্যু রহিত। আত্মার শোক নাই, দুঃখ নাই, ক্ষুধা নাই ও তৃষ্ণা নাই। আত্মা সত্যকাম অর্থাৎ আত্মার কামনা কখনও অপূর্ণ থাকেনা বা বিফল হয়না। আত্মা সত্য সংকল্প ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত। আত্মার মিথ্যা কিছুই নাই, সুতরাং আত্মার সকল প্রকার চিন্তাও সত্য। সকলেরই এই আত্মাকে অনুসন্ধান করা উচিৎ বা আবশ্যক।' (ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮/৭/১) বস্তুতঃই প্রাচীনকাল থেকেই যোগী ও ঋষিরা পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। উপনিষদে বর্নিত আত্মার যে স্বরূপধর্ম কথিত আছে তা আত্মনিষ্ঠ যোগীর মানসনেত্রে যাতে প্রতিভাত হয় তার জন্যই যোগসাধনার সূচনা। আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টাই যোগ সাধনার মূল কথা।

আত্মার বসতি স্থূল দেহে। জড় বিজ্ঞানের কোনো পরীক্ষা অথবা সূত্র দ্বারা আত্মাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা হলে বা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হলেই দেহের মৃত্যু ঘটে এবং মৃতেন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ বিচ্ছিন্ন আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। আবার স্থূল শরীরেও সাধারণভাবে আত্মার অস্তিত্বকে অনুভব করা যায় না -— অনুভব যা করা যায়, তা হলো 'মন'। মনের অবস্থান রূপে হৃদয়কে (Heart) চিহ্নিত করা হয় — যেহেতু হৃদয়ের সংকোচন-প্রসারণেই জীবাত্মা তার জীবন নির্বাহ করে। আধুনিক যোগবিজ্ঞান মতে মনের নিয়ন্ত্রণ সারা শরীর জুড়েই, তা কেবলমাত্র 'অনাহত' বা হৃদয় (বক্ষ) কেন্দ্রিক নয়। heart বা হৃদয়ের অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ তা জড় সত্তা। কিন্তু হৃদয় জড় সত্তা বিশিষ্ট হলেও তদুপরে আরোপিত process of thinking এর অধিকারী মন কখনই জড় নয়। আর এখানেই প্রকৃতির বিচিত্রা লীলা। অগ্নি জড়, কিন্তু তার দাহিকা শক্তি জড় নয়, দুগ্ধ জড় কিন্তু তার ধবলত্ব তারই প্রকাশ ভঙ্গি মাত্র ---তা জড় নয়। বায়ু ইন্দ্রিয় গোচর

ONLINE ISSN 2278-5264
Volume-I, Issue-II, October-2012
© Department of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India

নয়, কিন্তু তাই বলে তাকে অস্তিত্বহীন বলে অস্বীকার করা যায় না। সেই রূপ, প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির প্রকাশেই মনের বিচার ও তার বিশ্লেষণ --- তার রূপে বা আকারের বিচারে নয়। যা নিরাকার, অরূপ তার যে কোন আকার ধারনের ক্ষমতা বর্তমান এবং তার শক্তিমত্তা বা প্রচণ্ডতাও অনুনমেয়। বায়ুর আকার নেই কিন্তু তা প্রয়োজনে বাষ্পের আকার ধারণ করতে পারে। বিদ্যুতের আকার নেই কিন্তু তা বজ্রপাত রূপ প্রচন্ড তড়িৎ শক্তির আকার ধারণ করতে পারে। সে কারণেই ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে —-- "অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িতুরশরীরাণ্যেতানি, তদ যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুলখায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিণিষ্পদ্যন্তে" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮/১২/২)।

এ থেকেই আর একটি সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হয় এবং তা হলো ইন্দ্রিয়ের অগোচর অরূপ বস্তুগুলিকে কখনও রূপে বা কখনও শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ বা অনুভব করা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে যে বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই বিভিন্ন শক্তির ক্ষেত্রগুলি (energy field) সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল ক্ষেত্র গুলির বেশির ভাগই পারমাণবিক তথা আনুবিক্ষণীক আলোক কনিকা (atomic বা sub-atomic particle) অথবা তড়িৎ-চৌম্বকীয় কণিকার (electro-magnetic particle) দ্বারা তৈরী। পদার্থ বিজ্ঞানী ও তড়িৎ-বিজ্ঞানীরা আজ একথাও স্বীকার করে থাকেন যে, মহাজাগতিক বিস্ফোরণ বা big bang এর পর যে সকল আলক-কনিকার পারস্পরিক বিচ্যুতি বা কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলে এ সমস্ত ক্ষেত্র গুলির উৎপত্তি হয়েছিল এবং যার ফলে একদা সমগ্র সৌরমণ্ডল ব্যাপী মহাকর্ষজ বল ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে অভিকর্ষজ বল সৃষ্টি হয়েছিল আসলে তা একক শক্তির উৎস থেকেই সৃষ্ট। ফলতঃ যা দাড়ায় তা হলো, যুগ-যুগান্তর ব্যাপী বিভিন্ন শক্তির নিরন্তর খেলায়, অনু-পরুমানুর পারস্পরিক আণুরনন ও অগন্য যোগ-বিযোগে শূন্য থেকে ক্রমান্বয়ে সৃষ্ট — প্রাণ ও প্রাণীর বিবর্তন ঘটেছিল যে বলে, সেই বল বা শক্তির উৎস আসলে এক ও অভিন্ন। এই একক শক্তির উৎসস্থলকে যদি বেদান্তের ভাষায় 'ঈশ্বর' বা 'ব্রহ্ম' নামে অভিহিত করা যায় তবে স্বীকার করে নিতেই হয় যে তাবৎ জীব ও প্রাণীর সকলেই সেই একক শক্তির আধার অর্থাৎ একক উৎস অথবা ব্রহ্ম থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, যদি আমাদের উৎস একক ও একমেবদ্বিতীয়ম ব্রহ্মই হয় তবে তাকে আমরা কখনই উপলব্ধি করতে পারি না কেন? অর্থাৎ ব্রহ্মের যথার্থ উপলব্ধি জড় দেহাধারে সম্ভব হয়না কেন? এর উত্তর হলো শক্তিকে যেমন দেখা যায় না, তাকে উপলব্ধি করতে হয়, তেমনই ব্রহ্মকেও দেখা যায় না, তাকে উপলব্ধি করতে

হয়। কিন্তু ব্রহ্ম কখনই সাধারণ বা সাধারণের উপলব্ধির বিষয় নয়, তা একমাত্র যোগশাস্ত্র বা যোগসাধনা দ্বারাই উপলব্ধ হয়।

প্রকৃত পক্ষে 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' অভেদ হলেও আত্মসর্বস্ব ব্যক্তি কখনই ব্রহ্ম সম্পর্কে অবহিত নন। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন একমাত্র তিনিই জানেন আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ --— ব্রহ্ম স্বরূপ। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি কখনও স্থূল শরীরের অভিলাষী হন না। তিনি তার স্থূল দেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে সুখ-দুঃখ রহিত, কামনা-বাসনা বিবর্জিত সর্ব জীবের মঙ্গালাকাঙ্ক্ষায় মঙ্গালময়ের বহিঃপ্রকাশ রূপেই দেখে থাকেন। তিনি জানেন স্থূল দেহ আসলে সচ্চিদানন্দ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মার আবাসস্থল। দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর। তড়িতের যেমন আছে 'আলোক শক্তি', আত্মার তেমনই আছে 'প্রাণশক্তি'। এই 'প্রাণশক্তি' শুধু একটা কথার কথা নয় — তা বস্তুতঃই এক মহাশক্তি। শক্তির যেমন রূপান্তর ঘটে তেমনি 'প্রাণশক্তি' থেকেই সৃষ্টি হয় মায়া শক্তি, ইচ্ছা শক্তি প্রভৃতি। আর এই শক্তির রূপান্তরকেই সম্ভব করে তোলে যোগ। যখন প্রজ্ঞা বা প্রাণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে তখন বাহ্য জগতে তার কোনো প্রকাশ ঘটেনা। 'আমিত্ব'র সাধারণ অনুভব ঘটে থাকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে। অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটিই আমিত্বর অনুভব সৃষ্টিতে যথেষ্ট। ইন্দ্রিয়ের এই সক্ষমতাই 'আমিত্ব' থেকে 'ব্রহ্মত্ব'কে দূরে সরিয়ে রেখেছে। 'আমি' মনে করে 'মন' যা চায় তাই 'আমি' করি আর্থাৎ 'আমি' মনের বশ। আসলে 'আমি' বা আমার 'শরীর' যা চায় (ইন্দ্রিয় দ্বারা) তাই 'মন' করে আর্থাৎ 'মন' শরীরের বশ। শরীরের দুঃখ অথবা সুখের জন্য মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা তার দাসত্ব করে। সুতরাং 'আমিত্ব' ও 'আত্মত্ব' এক নয়। ব্রহ্ম শক্তিই বির্বতনের পথে সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয় শক্তির উপর সক্ষমতা প্রদান করেছে। ইন্দ্রিয় সকল আসলে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার একেকটা দ্বার মাত্র। আবার মনুষ্য ও অন্যান্য জীব মাত্রের ইন্দ্রিয়ের অতি সক্রিয়তাই ব্রহ্ম উপলব্ধির একমাত্র অন্তরায়। বর্হিজগতে ব্যাপ্ত মায়াময় বস্তু সঞ্চয়ের প্রতি 'প্রপঞ্চ' মন বা ইন্দ্রিয়ের বাসনা শক্তিই তার শক্তি ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। পঞ্চেন্দ্রিয়কে চালনা করে যে মন বা আত্মা তা সর্বদা সহজলভ্য প্রাপ্তির কারণে বহির্মুখী হওয়ায় তা কখনই অন্তঃশক্তিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। বহ্মের বিরাটত্বের কারণ একসময় নিহিত থাকে ক্ষুদ্র, অস্ফুট বীজাঙ্কুরে। বৃক্ষের শিকড় বা কাণ্ড সকল কিছুরই উৎপত্তি হয় বীজের অন্তর থেকেই। অর্থাৎ বৃক্ষের বিরাটত্বের অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত আছে ক্ষুদ্র বীজ শক্তিরই অভ্যন্তরে। আর জীবের ক্ষেত্রে তাই হলো 'প্রজ্ঞা' যা সৃষ্টিকল্প থেকেই সূচিত হয়। আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি সেই 'প্রজ্ঞা'কেই বিকশিত করে। ঝড়ের সময় রূদ্ধ দ্বার মুক্ত করলে যেমন

ঝড়ের প্রচণ্ডতার আঁচ পাওয়া যায় তেমনই যোগের দ্বারা আত্মজ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হলে জাগ্রত চৈতন্যের পথে ব্রহ্ম সত্তার স্বরূপত্বকে অনুভব করা যায়।

প্রাচীন কালে যোগসাধকরা সাধনা বলে ইচ্ছাশক্তি তথা ইন্দ্রিয় শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। ফলে অসাধ্য সাধন সম্ভব হতো। যোগসাধনা আসলে মনের সাধনা। অন্তরের সাধনা। ইন্দ্রিয় শক্তির প্রধান চালক মন। সাধারণতঃ তা সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই বহির্মুখী। যখন বহির্মুখী তখন তা ইন্দ্রিয়পরবশ — তখন তা 'আত্মা' নয় বরং 'আমিত্বে'র প্রকাশক —আর তখন তা ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তি সংহরণ করে অন্তর্মুখী তখনই তা কেবলমাত্র আত্মানুসন্ধানী, জ্ঞানী, ব্রহ্মস্বাদী। তখন তা জীবন-মৃত্যু রহিত —-- ব্রহ্মাণ্ড ও তার স্বরূপ অনুসন্ধানের অভিমুখী।

যোগশাস্ত্র অনুসারে দেহ ও মনের কার্যনির্বাহী শক্তি কেন্দ্র ছটি। এর মধ্যে প্রধান শক্তিকেন্দ্রটি হলো বক্ষ পিঞ্জর (thorax)। এটি শ্বাস-প্রশ্বাসের মূল কেন্দ্র। সংস্কৃত ভাষায় এর নাম 'অনাহত'। এর দ্বারা ফুসফুসের গতিকাল নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মূল শক্তি কেন্দ্রটি বিচলিত হলে দেহের অন্যান্য অংশে তার প্রভাব পড়ে, ফলে —-- যন্ত্রণা, ব্যাধির সৃষ্টি হয় ও অবশেষে মৃত্য ঘটে। এই মূল শক্তি কেন্দ্রটিই হলো 'প্রাণশক্তি'। যোগের ক্ষেত্রে প্রথমেই এই শক্তিকেন্দ্রটির নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। 'প্রাণশক্তি' অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করে প্রথমেই তাকে জয় করতে হবে — অর্থাৎ নিজের অধীন করতে হবে। নাড়ীর স্পন্দনকে মনের ইচ্ছাধীন করলেই — শরীর মনের অধীন হয়ে যাবে। তখন শরীরের (পঞ্চেন্দ্রিয়ের) ইচ্ছায় মন আর নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে না। প্রাণায়াম অভ্যাসের ফলে এই শ্বাস-প্রশ্বাস তথা স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের কাজ সম্ভব হয়।

শারীর বিজ্ঞানের সুষুম্না কাণ্ড (spinal cord) এবং সুষুম্না শীর্ষক (medulla oblongata)- এর বর্ণনা আছে। সুষুম্না কান্ডটি নলাকৃতির। মেরু মধ্যস্থ নলাকার এই প্রণালীটি দড়ির মতো। বস্তি প্রদেশ পর্যন্ত নেমে গিয়ে একটি সরু লাঙ্গুলান্তে (filum terminale) এটি শেষ হয়েছে। প্রায় ষোল ইঞ্চি লম্বা এটি। মাথার নীচে শরীরের সমস্ত অংশ থেকে স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ ইত্যাদি সংবেদনী অনুভুতি, পেশী কন্ডরা ও অস্থিসন্ধি তথা অস্থিবন্ধনী হতে অঙ্গ বিন্যাস সংশ্লিষ্ট অসংজ্ঞ পেশীর অনুভুতিগুলির কেন্দ্রাংশে বহন, চেষ্টীয় কেন্দ্রকোষের সাহায্যে পেশীর সংকোচন এবং চেষ্টীয় তন্তুর উর্ধ্বভাগের সাহায্যে এদের স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্য সুষুম্নাকান্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। সহযোগী শ্বসনকেন্দ্র ও নিম্নধমনী সংকোচক কেন্দ্র থাকাতে সময় সময় শ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্ত চলাচলের নিয়ন্ত্রণও সম্পাদিত হয় সুষুম্নাকান্ডের দ্বারা। সমব্যথী স্নায়ুর উৎপত্তিস্থল বলে তারারন্ধ্রের সংকোচন ও বিস্ফারণ, লালা ক্ষরণ, হৃদস্পন্দনের গতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি, পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিকোচন, রক্তনালীর সংকোচন, অ্যাড্রিনালিনের

ক্ষরণ প্রভৃতি কার্যও প্রভাবিত হয় সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা। এছাড়া মল-মূত্র ত্যাগের স্পৃহা, সন্তান প্রসব, প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ প্রভৃতিও সুষুম্নাকান্ডের নিম্নভাগ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

যোগবিজ্ঞানের সুষুম্নাকন্ডের এই নিম্নভাগ বা নিম্ন শক্তিকেন্দ্রটিকে বলা হয় মূলাধার। মূলাধার থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত কতকগুলি শক্তি কেন্দ্র রহেছে। এই 'পদ্ম' গুলি আসলে 'স্নায়ুজাল' বা plexus (বিবেকানন্দের ভাষায়) অর্থাৎ cappilaries of neurones. তন্ত্র সাধনা বা যোগসাধনায় সাতটি শক্তি স্থান অবলম্বনে সাতটি চক্রের কথা বলা হয়। এগুলি দেহের নীচ থেকে ওপরে এরূপ ঃ ১. মূলাধার (মেরুদন্ডের নীচ) ২. স্বাধিষ্ঠান (উদরের নীচ) ৩. মণিপুর (নাভিদেশ) ৪. অনাহত (বক্ষ বা হৃদয়) ৫. বিশুদ্ধ (কণ্ঠ) ৬. আজ্ঞাচক্র (ভ্রু দ্বেয়র মধ্যবর্তী অংশ) ৭. সহস্রার (মস্তকের উর্দ্ধভাগ)। মূলাধার চক্র বা sacro coccygeal plexus-এর চারটি শাখা। সৌরচক্র (solar plexus), কাণ্ড, ব্রহ্ম গ্রন্থি এবং তা থেকে প্রায় নয় ইঞ্চি নীচের অংশ। স্বাধিষ্ঠান চক্র বা sacral plexus এর ছটি শাখা। যৌনবোধ ও উত্তেজনা সহ অবসাদ, অসারতা, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, সন্দেহ-প্রবণতা প্রভৃতি মানসিক বিকারের জন্ম কেন্দ্র এটি। মণিপুর চক্রের ডান ও বামদিকে সমবেদী স্নায়ু শৃংখল অথবা ঈড়া-পিঙ্গলার সঙ্গে সেরিব্রো স্পাইনাল অক্ষের সংযোগ সাধিত হয়। এটি lumber plexus। এর দশটি শাখা। নিদ্রা, তৃষ্ণা, ঈর্ষা, লজ্জা, ভয়, নিশ্চলতা প্রকাশিত হয় এই স্থান থেকে। সমবেদী স্নায়ু শৃংখলের cardiac plexus এর বারোটি শাখা। এগুলি সবই হৃদপিন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। অহংবোধ, আশা, উদ্বেগ, সন্দেহ, প্রবঞ্চনা, অস্মিতা প্রভৃতির প্রকাশস্থল এটি। বিশুদ্ধ চক্র ভারতী চক্র (medulla oblongata এবং সুষুম্না কাণ্ডের সংযোগ স্থল) এবং লালনা চক্র (আলজিহ্বার বিপরীত দিকের অংশ) নিয়ে গঠিত। ভারতী চক্র ল্যারিংস এবং সন্নিহিত কয়েকটি অঙ্গকে (organ) নিয়ন্ত্রণ করে। লালনা চক্র শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, অনুশোচনার সৃষ্টিস্থল। আজ্ঞাচক্র ও মানসচক্র আসলে sensory motortract এবং তা দুটি ভাগে (lobe) বিভক্ত হয়ে যাবতীয় অঙ্গ সংস্থান চালনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর সংবেদী স্নায়ুগুলি —-- স্বপ্ন, দৃষ্টিবিভ্রম ইত্যাদির কেন্দ্র। সহস্রার চক্র গুরু মস্তিষ্কের উপরিভাগে অবস্থিত। এটি জীব বা জীবাত্মার বিশেষ ও সর্বোচ্চ আসন। কুলকুন্ডলিনীকে জাগ্রত করার পর তা সহস্রার চক্রে উপনীত হলেই সাধকের সমাধির ন্যায় চরম অবস্থা প্রাপ্তি হয়।

'পাতঞ্জল যোগদর্শনে' অষ্টাঙ্গ আগের বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা শাশ্বত ও বৈজ্ঞানিক। অষ্টাঙ্গ যোগের আটটি অঙ্গ যথাক্রমে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। সাধনার ক্ষেত্রে এই অষ্টাঙ্গ যোগই হলো আমাদের জীবন পথের উত্তরণের একমাত্র সোপান, যা আমাদের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ব্রহ্মত্ব

ONLINE ISSN 2278-5264
Volume-I, Issue-II, October-2012
© Department of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India

লাভের একমাত্র মাধ্যমও। সাধকমাত্রেই চান কুলকুন্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে। কিন্তু এর জন্য চাই প্রভূত ইচ্ছাশক্তি ও সংযম। মনের শক্তি এর অন্যতম প্রধান অবলম্বন। প্রশ্নজাগে 'মন' কি? স্পন্দন বা কম্পনের ফলে উদ্ভূত পরমাণুর সূক্ষ্মতর অবস্থাকেই বেদান্তে 'মন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে পেরেছি যে সমগ্র জগৎ জড় ও প্রকৃতির সমবায়ে উৎপন্ন হয়েছে। জড় জগৎ কতকগুলি পদার্থের কম্পন ভিন্ন আর কিছুই নয়। অসংখ্য পরমাণু কণিকার অবিচল সংঘাত অথবা উত্থান-পতনে সৃষ্টি হয়েছে জড় বস্তু। জড় বস্তুর মধ্যে অনু-পরমাণুর কম্পন বা স্পন্দন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটে চলেছে। এভাবেই পদার্থ থেকে উদ্ভুত শক্তিগুলিও স্পন্দনাবস্থা থেকেই সৃষ্ট। উত্তাপ, আলো, শব্দ। স্পর্শ, গন্ধ এভাবেই আমাদের সংবেদন সৃষ্টি করছে। জীব নিজেও পরমাণুর সমষ্টি। বায়ুর কম্পন থেকে সৃষ্ট শব্দ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় আমাদের কর্ণগোচর হয় এবং একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলে তা আর কর্ণগোচর হয় না। এই কর্ণগোচরীভূত হওয়ার ক্রিয়াটিও আবার মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সূক্ষ্মতর মনের মূলে যে প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বোধ ও বোধীর অবস্থান তাই-ই পরমসত্য বা আত্মা রূপে বিরাজমান। মন ও আত্মার পার্থক্য অনেকটা লৌহ খন্ড ও অগ্নিকুন্ডের ন্যায়। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুন্ডে এক খন্ড লোহা রাখলে তা যেমন ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয় ও লোহিত বর্ণ ধারণ করে সেরূপ মন নামক পদার্থটিও চৈতন্যময় আত্মার সংস্পর্শে আসলে প্রজ্ঞাঘন আত্মা চুম্বকখন্ডের ন্যায় মনকে আকর্ষণ করে নেয়। তখন মনের পৃথক আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না এবং তখন মনের অস্তিত্ব ক্রমে ক্রমে 'ব্রহ্মত্বে' বিলীন হয়ে যায়।

'অহং' বা 'আমি' নামক অনুভূতিকে প্রকাশ করে মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষ। ঐ কোষগুলিতে একরূপ আনবিক কম্পন অনুভূত হলে তখন তা আর 'অহং' এর অনুভব থাকে না, তা ক্রমশঃ 'তত্ত্বমসি' ভাবে রূপান্তরিত হয়। এর জন্যই যোগ সাধনার প্রয়োজন। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বলেছেন, "মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। যার চর্তুদল পদ্ম। যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনী রূপে আছেন। যেন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। প্রসুপ্ত ভুজগাকার আধার পদ্মবাসিনী। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। ... ইনি জাগ্রত না হলে ভগবান দর্শন হয় না। ভক্তিযোগে কুলকুণ্ডলিনী শীঘ্র জাগ্রত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হলে ভাব, ভক্তি, প্রেম --- এই সব হয়।" (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত পৃঃ ৩৫৬, ৬৪২)। যোগ সাধনায় জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগের কথা বলা হয়। এর মধ্যে উৎকৃষ্ট হলো রাজযোগ। কুলকুণ্ডলিনী হলেন কুল বা দেহস্থ শক্তি অর্থাৎ প্রাণশক্তি। মূলতঃ যোগবলে এই শক্তিকে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বগতি করাই সাধকের একান্ত সাধনার লক্ষ্য। এই শক্তি মানবদেহের মস্তিষ্কের সহস্রারস্থ কূট স্থানের শক্তি, যা

মানব দেহের ব্রহ্মরন্ধ্র (পরমাত্মার স্থান) থেকে নির্গত হয়ে মূলাধার অঞ্চলে এসে potential energy রূপে বিরাজ করে। সাধকেরা তাঁদের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সাধনার মধ্য দিয়ে এই শক্তিকে পুনরায় মূলাধার অঞ্চল থেকে বিপরীত গতিতে প্রবাহিত করে কূটস্থানে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই শক্তি যখন পুনরায় সহস্রারে গিয়ে উপস্থিত হয় তখন সাধকের জ্ঞান জ্ঞাত জগৎ থেকে অজ্ঞাত জগতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সমাধি সূচিত হয়। সমাধি অবস্থায় সাধক বা যোগী পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন যা মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে যোগদর্শনে বর্ণিত হয়েছে। এই জ্ঞানাতীত চেতনার স্তরটির নাম তুরীয় স্তর। এই অবস্থায় যোগী তাঁর শুদ্ধ আধ্যাত্মিক স্বরূপটি ফিরে পান। সাধকের প্রাণ যে অনন্ত চৈতন্যরই অবিচ্ছিন্ন অংশ এ পর্বে এসে তা তিনি অনুভব করেন। তখন সাধকের শরীর থেকে এক অনির্বচনীয় দিব্য জ্যোতির প্রকাশ ঘটে। যোগের পথে ক্রমোন্মেষে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে 'ওম' ধ্বনির উচ্চারণ সাধকের সাধনাকে ত্বরান্বিত করে। যোগী সমাধি স্তরে পৌঁছালে জ্যোতির্ময় আলোক বলয়ের মাঝে 'ওম' কারকে তাঁর মানস নেত্রে প্রত্যক্ষও করে থাকেন।

যোগ সাধনার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের সামাজিক, মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতি সাধন এবং সর্বোপরি আপন মানবিক সত্তার বিকাশ। যোগ ও মননের দ্বারা মনুষ্যের পক্ষে অসীম জ্ঞান সম্পদের অধিকারী হওয়া সম্ভব। যোগ সাধনা আসলে ঈশ্বর সাধনার নিমিত্ত শারীর বিজ্ঞানেরই এক অভূতপূর্ব ও আশ্চর্য প্রয়োগ। 'আত্ম' থেকে 'ব্রহ্মত্মে' উন্নীত হওয়ার পথে 'যোগবিজ্ঞান' যে আধ্যাত্মসাধনার একমাত্র ও অপরিহার্য পথ একথা তাই আর কোনো ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

ONLINE ISSN 2278-5264
Volume-I, Issue-II, October-2012
© Department of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India

গ্রন্থ ঋণ :-

১. বেদান্ত মুক্তির বাণী — স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

২. যোগদর্শন ও যোগসাধনা — স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।

৩. প্রশান্তি লাভের উপায় — স্বপন কুমার দাশ, আয়রনম্যান পাবলিশার্স।

৪. বিজ্ঞানে ঈশ্বরের সংকেত — মণি ভৌমিক, আনন্দ পাবলিশিং হাউস।

৫. মানসিক চাপ জয় করার উপায় — স্বামী গোকুলানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

৬. শারীরবৃত্ত — ড. রুদ্রেন্দ্র কুমার পাল।

৭. শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত (১ম খণ্ড) — শ্রীম কথিত।

*ড.অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা জে.এন.এম.এস. মহাবিদ্যালয়, উঃ ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ)।

ONLINE ISSN 2278-5264
Volume-I, Issue-II, October-2012
© Department of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India